নির্বাসিত বাহিরে অন্তরে

শুভপ্রসাদ নন্দী মজুমদার

আমার বাংলা

আমিও বাঙালি। আমার জন্ম শিলং-এ। শৈশবের একটা ছোট্ট সময় ধুবড়ি শহরে। বড় হওয়া শিলচরে। এখন 'বুড়ো' হচ্ছি পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান ও কলকাতায়। শৈশবে আমার দেখা শোনা করত অ্যাম্বি নামে এক খাসি রমণী, যার চেহারা আমি ভুলে গেলেও যে গান গেয়ে সে ঘুম পাড়াতো তার সুর এখনও আমার কানে বাজে। আমাদের নেপালি কাজের ছেলে কাজের ফাঁকে ফাঁকে গান গাইত, 'নেপালিরাজা মহেন্দ্র কেটা বসে রো..।' সন্ধ্যায় জেঠুর কীর্তনের আসরে উদ্বাস্তু শিল্পী বাজারের আলুবিক্রেতা গণেশ গাইত 'তোমার বদল দিয়া যাও বাঁশি ও প্রাণনাথ। বদল দিয়া যাও নইলে এ দাসীরে সঙ্গে নিও'। ডিসেম্বরের কনকনে শীতের রাতে দূর থেকে ভেসে আসত খাসি ছেলেমেয়েদের ড্রাম্‌সের তাল, গীটারের ঝংকার আর খ্রিস্টমাস ক্যারলের সুর। রোববারের সকাল মানে গির্জার এক নাগাড়ে বেজে যাওয়া ঘন্টার ধ্বনি। আমাদের বাড়ির বৈঠকখানায় জেঠুর বন্ধুদের অলস আড্ডা, যার দরজা দিয়ে দেখা যায় রাস্তা দিয়ে স্নান সেরে সুসজ্জিত পোশাকে রঙীন হয়ে সার বেঁধে চলেছে খাসি পুরুষ মহিলা শিশু গির্জার দিকে সাপ্তাহিক প্রার্থনায়। মাঝে মাঝে দুপুর বেলা কুচকুচে কালো হিন্দুস্থানি মহিলা ভিখারি, যাকে লালপরী বলে ডাকতাম আমরা, সে তার লোহার সরু শিক দিয়ে তৈরি লাঠিকে ভিক্ষাপাত্রের ওপর সারিন্দার মত ঘসে ঘসে গান গাইত, 'লালপরী রাধে গোলাপপরী রাধে, লচকি লচকি চলি আয়' বা 'সখিরে টুনুমুনু টুনুমুনু তবলা বাজে আউরন বাজে না, আউরান বাজে না সখি রে, আউরান বাজে না'। শিলং শহরে জমাদার মানে লম্বা চেহারার শিখরা। বেতের তৈরি বিশাল বিশাল আইসক্রিম কোনের আকৃতির টুকড়ি ও লম্বা ঝাড়ু দিয়ে ওরা শহরের রাস্তা, গৃহস্থ বাড়ির উঠোন বাথরুম ইত্যাদি পরিষ্কার করত। আমার ছোটবেলার আরাধ্য পুরুষ ছিল শিলং-এর সিটিবাসের খাসি যুবক কনডাক্টর, যে বাস ছাড়ার পর দৌড়ে বাসে উঠত, থামার অনেক আগেই লাফ দিয়ে নামত বাস থেকে। বাসের ভেতরে দেওয়ালে লেখা থাকত ইংরেজি হরফে খাসি ভাষায়, 'ওয়াট টা শুন', নীচে ইংরেজিতে লেখা 'ডোন্ট রাব লাইম'। কলকাতার বাসে যেখানে লেখা থাকে 'পকেটমার থেকে সাবধান', শিলং-এর বাসে ওই জায়গাতেই লেখা থাকত কথাগুলি। সম্ভবত পকেটমার যাওয়া আমার শৈশবে সেখানকার বাস্তবতা ছিল না। তার চেয়ে বেশি সতর্ক করা প্রয়োজন ছিল পান খেয়ে চূণ যাতে বাসের গায়ে না মোছা হয়। যাত্রীরা সকলে ওই লেখাটির পাশেই রাজ্যের চূণ মুছতেন। আমার প্রথম স্কুলে যাওয়া ধুবড়িতে। সেখানে শিলিগুড়ি রেডিওর শিল্পী প্রফুল্ল চক্রবর্তী আমার দিদিকে রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখাতেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতের পাশাপাশি মাঝে মাঝে শেখাতেন বরগীত, গোয়ালপাড়িয়া গান। দিদির গানের খাতায় 'কদম্বতলে সই শ্যামল রাজে' গানের ওপর লেখা শিরোনাম বরগীত কথাটিতেই সম্ভবত আমার প্রথম পেটকাটা অসমীয়া 'র' চাক্ষুষ করা। প্রফুল্ল বাবু যেমন শেখাতেন 'সঘনগহন রাত্রি ঝরিছে শ্রাবণধারা', আবার শেখাতেন, 'পায়বা ঘুঙুরা বাজে রে, কেমনে বাহিরা যাওঁ/ ঘরে মোর শ্বশুর বাইরা মোর ভাসুর রে/ ওকি ক্যামনে ঘাটে যাঁওরে'। রঙালী বিহুর রাত্রিতে বাড়ির সকলে শিশু-আমাকে আমাদের হিন্দুস্থানি কাজের লোক সুব্‌নারায়ণের হেফাজতে রেখে লুকিয়ে বিহুতলীতে ভূপেন হাজারিকার গান শুনতে গিয়েছিল। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গিয়ে বিশ্বাসভঙ্গের হতাশ-কান্না কেঁদেছিলাম চীৎকার করে। পরের দিন থেকে মাঝে মাঝেই বাড়িতে শুনতাম এ ঘর থেকে ও ঘর যাওয়ার সময় বাবা গাইছে, 'জুকিয়া হজলি বান্ধিল টুপলি'। তারপর আবার শিলং। তখন আমি বালক। পৌষসংক্রান্তিতে 'মেরামেরির ঘর' বানানোর জন্যে বন্ধুদের সাথে লাবান পাহাড়ে বস্তা নিয়ে শুকনো পাইন পাতা সংগ্রহ করি সারা দুপুর। ঝুলনযাত্রায় সাজাবো বলে কাঠের গুঁড়ো আনতে বুচার রোডের নির্জন রাস্তা দিয়ে বড় বাজারের কাঠ চেরাইয়ের কারখানায় হাজির হই। শৈশব ও কৈশোরের দিনগুলি কাটত দুঃসাহসিকতার পাশাপাশি এক অজানা আতঙ্কে। বড়রা ভয় দেখাতেন 'সাপপুজা'রা ধরে নিয়ে যাবে। 'সাপপুজা' ছেলেধরার শিলং-সংস্করণ। বড় হয়ে জেনেছি, যাদের সম্পর্কে ভয় ছড়ানো হত, তারা অ-খ্রিস্টান আদিম ধর্মে বিশ্বাসী খাসি মানুষ। তবে তাঁরা সত্যিই বাচ্চা ছেলেদের ধরে নিয়ে সাপ পুজা করে কি না আজো জানি না। হয়ত এখানে লুকিয়ে আছে ট্রাইবেল অ-ট্রাইবেল পারস্পরিক

অবিশ্বাসের সম্পর্কের কোনো প্রত্নস্মৃতি। শীতকাল এলেই শীতের লম্বা ছুটি, মানেই শিলচরে দাদু বাড়ি যাওয়া। শিলচর মানেই পুকুর, রিক্সা, গরুর ঘর, ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক। চালওয়ালা রিয়াসত আলি আর মনিপুরি মুড়িওয়ালি। দিদিমার গলা জড়িয়ে রাত্রিবেলা ঘুমোতে গিয়ে 'শীতবসন্ত' আর 'বুদ্ধুভুতুমের গল্প' শোনা। তারপর কিশোর বয়সে যখন আসি শিলচর শহরে তখন বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ চলছে। মাঝে মাঝেই শহরে দেখতাম কিছু গাড়ি যার নম্বর প্লেটে লেখা 'ঢাকা-ক' কিংবা 'সিলেট-চ' ইত্যাদি। আকাশবাণীর সকাল সাড়ে সাতটার সংবাদে যেদিন বলল চাঁদপুর খানসেনার হাত থেকে মুক্ত হয়েছে, তখন বাবার চুল কাটছিল উঠোনে রাস্তার বড় রাস্তার ধারের নাপিত। পাশের চৌকিতে রাখা ট্র্যানজিস্টরে এই খবর বেজে উঠতেই চিরুনি কাঁচি ফেলে একেবারে নেচে উঠল সে, 'চান্দপুর দখল করছে, ব্যাশ (বেশ) করছে, ব্যাশ (বেশ) করছে'। তখনই জানলাম সে চাঁদপুর থেকে আসা মুক্তিযুদ্ধের এক শরণার্থী। বাহাত্তরে প্রথম হাঁটি মিছিলে। গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় জোর করে বাঙালি ছাত্রদের ওপর অসমীয়া শিক্ষার মাধ্যম চাপিয়ে দিতে চাইলে গর্জে ওঠে তৎকালীন অবিভক্ত কাছাড় জেলা। স্কুল থেকে নাইন টেনের দাদা লাইন করে নিয়ে যেত ভাষা আন্দোলনের মিছিলে। কিছু নেতা শ্লোগান দিতে চাইতেন 'বাংলাভাষা জিন্দাবাদ' বলে, আবার কিছু ছাত্রনেতা 'বাংলাভাষা জিন্দাবাদ' বলেই বলতেন 'মাতৃভাষা জিন্দাবাদ'। বলতেন, 'সমস্ত ভাষাগোষ্ঠীকে সর্বস্তরে মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের পূর্ণ সুযোগ দিতে হবে'।

এই আমার বাংলা। এটা যে 'অন্য' বাংলা তখন বুঝি নি। আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বা মেঘালয়ের শিলং বা নাগাল্যান্ড, মনিপুরের ছিটমহলের মতো ছোট ছোট বাঙালি মহল্লা থেকে বাংলার রাষ্ট্রসীমা থেকে নির্বাসিতা বঙ্গীয় জনপদ বাঙালির তৃতীয় ভুবন বরাক উপত্যকা কিংবা ত্রিপুরা অবধি ছড়িয়ে থাকা এই 'অন্য' বাংলা। এই বাংলার পরতে পরতে লেগে আছে সাংস্কৃতিক বহুত্বের বর্ণচ্ছটা, যা তাকে দিয়েছে বাংলার মূল ভূগোল থেকে স্বতন্ত্র এক বৈশিষ্ট্য।

'বাংলা'-র মুখোমুখি

যে বাংলা জেগে আছে গঙ্গা পদ্মার তীরে সেখানে আমাদের আবাল্য স্বপ্নে যাওয়া আসা। সেই বাংলার সাথে আজীবন আমাদের কথোপকথন চলে কল্পনায়। ওই 'আসল' বাংলার সাথে বাস্তবের জগতে প্রথম মুখোমুখি হওয়ার মুহূর্তে আমাদের অনেক স্বপ্ন হয়ত কখনো ভেঙে পড়ে। এই ভেঙে পড়া স্বপ্ন আবার নতুন ভাষা যোগায় আমাদের বাঙালিত্বে। ছোটবেলার একটি কৌতুককর স্মৃতি হঠাৎ মনে এল। শিলং-এর লাবানের সিলেটি পাড়ায় কোনও এক বাড়িতে এক পশ্চিমবঙ্গীয় অতিথি এসেছিলেন। তিনি পাড়ার ছেলেদের সিলেটি কথোপকথন বুঝতে না পেরে অসহায়তা প্রকাশ করলে সেই দলের জনৈক ছেলে অবাক হয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করে, 'কি আশ্চর্য! তুমি বাঙালি হয়ে বাংলা বোঝো না?' আমাদের কথা, ব্যথা, আমাদের হাসি কান্না অভিমানকে অবিভক্ত বাঙালিত্বের অভিন্ন অংশই ভেবেছি আমরা। ফলেই আমাদের কোনও কিছু বুঝতে না-পারা বাংলা বা বাঙালিকে বুঝতে না-পারাই ছিল আমাদের কাছে। সেজন্যেই হয়ত এই বিস্ময়, অভিমান। বলা বাহুল্য, এই সরল ধারণাটি শৈশবের। তবে যৌবনে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এসে ধাক্কা লাগল অন্য জায়গায়। আমি আর আমার শহরের বাসিন্দা ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেকজন ছাত্র আমাদের সিলেটি উপভাষায় কথা বল্লেই সহপাঠীরা বলত, 'এই রে এরা আবার অসমীয়াতে কথা বলতে শুরু করেছে।' অর্থাৎ আমাদের উপভাষা তবে বাঙালি-ভুবনে অন্তর্ভুক্ত নয়! তখন ১৯৮৪ সাল। আসাম রাজ্য জুড়ে চলছে প্রথমে 'বহিরাগত বিতাড়ন', পরে 'বিদেশি বিতাড়ন' নাম দিয়ে এক প্রবল বাঙালি বিরোধী উগ্র জাতীয়তাবাদী হিংসাত্মক আন্দোলন। এই আন্দোলনের জেরে উচ্চশিক্ষার জন্যে গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বদলে পশ্চিমবঙ্গে যাওয়া। কলকাতা শহরে নেমে শিয়ালদা স্টেশন সংলগ্ন দেওয়ালে বাংলায় লেখা দেওয়াল লিখন দেখে ভির্মি খাওয়ার জোগাড়। বিশাল দেওয়ালে বিশাল হরফে লেখা, 'আসামের জনগণের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে আসুন।' মাত্র চব্বিশ ঘন্টার ট্রেনযাত্রার দূরত্বে যে ভূগোল, তার বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে কি পর্যায়ের অজ্ঞানতা, তা ভেবে বিস্মিত হয়েছি। অবশ্য তখনও আসাম কলকাতার সংবাদপত্রে 'আসাম'ই রয়েছে, এখনকার মত 'অসম' হয় নি। তারও আরো কয়েক বছর পর, কলকাতায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ডিং করতে এলে রবীন্দ্রসঙ্গীতের এক

দিকপাল ট্রেনার আমাকে প্রশ্ন করেন, শিলচরের মানুষ রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনে কি? যখন আমার মুখ থেকে পর পর জানতে পারলেন, ওখানকার সরকারি ভাষাও বাংলা, রেডিওতে বাংলাতেই অনুষ্ঠান হয়, তখন তাঁর বিস্ময়ের শেষ নেই। বিস্মিত তাঁর শেষ প্রশ্ন ছিল, সাইনবোর্ডও কি...? আমি বলি হ্যাঁ। খুব বেশিদিন আগেকার কথা নয়। সম্ভবত ১৯৯৯ সালে শিলচরে অনুষ্ঠান করতে এসে সঙ্গীতশিল্পী কবীর সুমন (তখন চট্টোপাধ্যায়) অনুষ্ঠান শুরুর আগে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, উপস্থিত শ্রোতাদের কত শতাংশ বাংলা বোঝেন। যখন শুনলেন শ্রোতাদের প্রায় সবাই বাঙালি এবং বাঙালি ছাড়াও মুষ্টিমেয় অন্য ভাষাগোষ্ঠীর যে শ্রোতারা এসেছেন, তারা সকলেই খুব ভালো বাংলা বোঝেন, তখন প্রথমে তাঁর ধারণা হয়, ওপার থেকে বঙ্গভাষীরা বিপুল সংখ্যায় এসে বোধহয় স্থানীয় বাসিন্দাদের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করেই নিজেদের জনপদ গড়েছে। যাইহোক, সেবারই তাঁর সে ভুল ভেঙে যায়। উত্তর পূর্ব ভারতের সমস্ত বাঙালি জনপদ নিয়েই আমাদের মূল ভূখণ্ডে নানা বিভ্রান্তি। যদিও সে অর্থে ভৌগোলিক বা সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা কখনোই ছিল না কলকাতার সাথে এই অঞ্চলের। সাম্প্রতিক সময়ে উত্তর পূর্বাঞ্চলের গুয়াহাটি, ডিব্রুগড়, শিলচর, করিমগঞ্জ থেকে অসংখ্য বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হচ্ছে (ত্রিপুরাকে আপাতত এই আলোচনার বাইরে রাখছি। ত্রিপুরার পরিস্থিতি গুণগতভাবে কিছুটা আলাদা, যদিও দূরত্ব রয়েছে ত্রিপুরার সাথেও)। কিন্তু এর আগে এই অঞ্চলের বাঙালি মানুষ সংবাদের জন্যে কলকাতার সংবাদপত্রের ওপরই নির্ভরশীল ছিলেন। শৈশবে মনে আছে শিলং-এ কলকাতার সংবাদপত্র বাড়ি বাড়ি বিলি হত সন্ধ্যায়। কলকাতায় প্রভাতের সাথে যেমন সংবাদপত্রের হকার একাকার, আমাদের শৈশবে শিলং-এ সন্ধ্যা মানেই হকারের ছুঁড়ে দেওয়া খবরের কাগজ। কিশোর বয়সে শিলচরে এসে দেখলাম, ভোরের ফ্লাইটের সুবাদে এখানে খবরের কাগজ পৌঁছে যায় সকাল এগারোটার মধ্যেই শহরে। এ নিয়ে শিলচরের লোকের গোপন অহংকারও ছিল। সাহিত্য সাময়িকী, গানের রেকর্ড, পুজোর সময় কিংবা শীতকালের গানের অনুষ্ঠানের শিল্পী- সমস্ত কিছুর জন্যে কলকাতার সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক জগতের সাথে উত্তর পূর্বের বাঙালি জনপদের ছিল এক জীবন্ত যোগাযোগ। তবুও যেন 'কাছে থেকে দূর রচিল'।

রাজ্যের নাম আসাম, নদীর নাম বরাক

রাজ্যের পরিচয়ে আমি আসামের বাসিন্দা। অঞ্চলের পরিচয়ে আমি বরাক উপত্যকার বাঙালি। আমরা নিজেদের বলি উনিশের সন্তান। বহির্আসামে আমি আসামের সাংস্কৃতিক বহুত্বের প্রতিনিধি। তখন ভাটিয়ালির পাশাপাশি বিহুও আমার গান। গলায় অসমীয়া গামছা জড়িয়ে আমি রবীন্দ্রসঙ্গীত গাই। কিন্তু রাজ্যের অভ্যন্তরে বরাক উপত্যকায় যখন রবীন্দ্রজয়ন্তীর দিন সরকারি সিদ্ধান্তে বিহুর অনুষ্ঠান চাপিয়ে দেওয়া হয় বরাকের মাটিতে, তখন তা আমার ওপর সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের অঙ্গ। অসমীয়া একই সঙ্গে আমার ভ্রাতৃভাষা, আবার সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের ভাষাও। বরাক উপত্যকায় অসমীয়া গামছা সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের প্রতীক। দুর্গাপুজায় দশমীর বিসর্জনের মিছিলে পরিকল্পিতভাবে কারা যেন ছড়িয়ে দেয় অসমীয়া গামছা, ঠিক যেভাবে শহীদের রক্তত্যাগের বিনিময়ে বরাকের সরকারি ভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও নিঃশব্দে সরকারি ঘোষণাপত্র, বিজ্ঞাপন ও চিঠিপত্র ছাপা হয় অসমীয়া ভাষায়। আসামের দু'টি প্রধান নদী, ব্রহ্মপুত্র, বরাক ও দু'টি পার্বত্য জেলা আসামের তিনটি ভাষিক অঞ্চলকে প্রতিনিধিত্ব করে। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার সরকারি ভাষা অসমীয়া, বরাকের বাংলা এবং দু'টি পার্বত্য জেলার ইংরেজি। তিনটি অঞ্চলের মধ্যে সরকারি যোগাযোগের ভাষা ইংরেজি। আসামের যে কোনও অঞ্চলের ভাষিক পরিচয় বলতে গেলে 'মূলত' কথাটা বলতেই হয়, কারণ সে অর্থে কোনও একভাষী অঞ্চল আসামে নেই। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় অসমীয়াভাষী মানুষের পাশাপাশি বিশাল সংখ্যক অন্য জাতি উপজাতির মানুষ রয়েছেন। বাঙালি হিন্দু মুসলিম আছে বিপুল সংখ্যায়। সাধারণভাবে বহির্আসামে মনে করা হয়, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাঙালিরা বোধহয় সকলেই দেশভাগের পর আসামে এসেছেন। এটা ঐতিহাসিকভাবে সত্য নয়। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বাঙালি বসতি কয়েক শ বছরের পুরনো। উত্তর কাছাড় বা ডিমা হাসাও জেলাকে ডিমাসা সম্প্রদায়ের সাথে চিহ্নিত করা হলেও সেখানে বিশাল সংখ্যক নাগা, কুকি ও অন্য সম্প্রদায়ের বাস স্মরণাতীত কাল থেকে। একই ভাবে, কার্বি আংলং কার্বি উপজাতির সাথে সম্পর্কিত হলেও সেখানেও নানা জাতি উপজাতির বাস। আসামের অন্যত্র বাঙালিরা অভিবাসী হলেও, বরাক উপত্যকায় মানুষ নয়, মাটিটাই অভিবাসী। অভিবাসী কথাটা ব্যবহার না করে উত্তর

পূর্বের বাঙালি আজন্ম যে শব্দটি শুনে অভ্যস্ত, তা ব্যবহার করাই সঙ্গত। 'রিফুজি'। 'রিফুজি' কথাটায় যে আত্মঅবমাননা, যে অশ্রুসিক্ত ইতিহাস লুকিয়ে আছে, তা অভিবাসী শব্দে ধরা পড়বে না। বরাক উপত্যকার কথ্য ভাষায় প্যারাসাইট গোত্রের উদ্ভিদকে বলে 'রিফুজি লতা'। আমরা যে অন্ন গ্রহণ করি, তা কারো চোখে পরান্নের সমতুল। আসামের অন্যত্র 'রিফুজি' মানুষই শুধু পাওয়া যাবে। কিন্তু বরাক উপত্যকার মাটিও 'রিফুজি'। এ অঞ্চলের প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী ড° সুজিৎ চৌধুরীর একটি ইংরেজি নিবন্ধের অংশ বিশেষের বঙ্গানুবাদ এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে।

টি এস এলিয়ট 'ইতিহাসের পরিকল্পিত অলিন্দ ও চতুর পথ' এর কথা বলেছিলেন। ফলেই একটি দেশের সামাজিক- সাংস্কৃতিক মানচিত্রের সাথে সে অঞ্চলের ওপর একটি নির্দিষ্ট সময়খণ্ডে ইতিহাসের চাপিয়ে দেওয়া রাজনৈতিক সীমার সামঞ্জস্য না থাকাটা কোনও অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। আসামের দক্ষিণাঞ্চলের কাছাড়, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি জেলা নিয়ে গঠিত বরাক উপত্যকা নামের আজকের জনপদ এই অসামঞ্জস্যের সবচেয়ে বড় প্রমাণ। একই সঙ্গে এটাও সত্য, উত্তর পূর্বাঞ্চলের অন্য প্রতিবেশি অঞ্চলের চেয়ে সাংস্কৃতিক দিক থেকে এই অঞ্চল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

ভৌগোলিক. ভাষিক, সামাজিক ও সংস্কৃতিগত দিক থেকে বরাক উপত্যকার বাংলার পূর্বাঞ্চলেরই স্বাভাবিক সম্প্রসারণ। ১৮৭৪ সালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি আসামকে রাজ্য হিসাবে গঠন করার সময় নতুন রাজ্যের রাজস্ব ঘাটতির সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য বাংলা প্রেসিডেন্সি থেকে বঙ্গভাসী সিলেট ও কাছাড় জেলাকে কেটে এনে আসাম রাজ্যের সাথে জুড়ে দেয়। সুরমা উপত্যকা নামে একটি নতুন কমিশনার শাসিত প্রশাসনিক বিভাগের জন্ম হয় এই দুই জেলা নিয়ে। ১৯৪৭ সালে এই বিভাগের সিলেট জেলার সিংহভাগ অংশ হস্তান্তরিত হয় পূর্ব পাকিস্তানে। সুরমা উপত্যকার এপারে পড়ে থাকা বাকি অংশকেই এখন বলা হয় বরাক উপত্যকা, যা কাছাড়, করিমগঞ্জ ও হাইলাকন্দি জেলা নামে তিনটি জেলায় পরবর্তীতে পুনর্গঠিত হয়। প্রকৃতপক্ষে, সুরমা-বরাক অঞ্চল অর্থাৎ বিভাগ-পূর্ব সিলেট ও কাছাড় স্মরণাতীত কাল থেকেই একটি অভিন্ন সাংস্কৃতিক ভূগোলের অংশ।

এই সময়ে একই সাথে আসামের সাথে যুক্ত করা হয়েছিল অবিভক্ত রংপুর জেলার গোয়ালপাড়াকেও, স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে সরকারি উদ্যোগে যার বঙ্গভাষী চরিত্র মুছে দিয়ে অসমীয়াকরণ করা হয়েছে। সংযুক্তিকরণের সময়েই ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় অসমীয়ারা ও সুরমা উপত্যকায় বাঙালিরা এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে নিজেদের ভাষা সংস্কৃতির বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা করেছিলেন পরস্পরের দিক থেকে। বাঙালিদের তরফ থেকে অসমীয়ারা বিপদ দেখেছিলেন এই কারণে, ব্রিটিশরা আসাম অধিগ্রহণ করার পর আসামের অফিস আদালতে সরকারি ভাষা হিসাবে বাংলা ভাষা চালু হয়েছিল এবং তা বহালও ছিল প্রায় ৩৬ বছর। ১৮২৪ সালে ব্রিটিশ আসাম অধিগ্রহণ করার পর ১৮৩৬ সাল থেকে ১৮৭২ সাল অবধি আসামের সরকারি ভাষা ছিল বাংলা। অসমীয়ারা একে স্বাভাবিকভাবেই বাঙালিদের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন হিসাবে দেখেছেন। যে সিদ্ধান্তের জের প্রায় দুশো বছর ধরে আসামের বাঙালি অসমীয়ার পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আজো কালোছায়া ফেলে রেখেছে। ব্রিটিশদের এই সিদ্ধান্ত নিয়ে ঐতিহাসিকরা এখনো ধন্দে। কেন এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল? কারো মত, অসমীয়া ভাষা শুনে ব্রিটিশ শাসকদের এঁকে বাংলারই একটি উপভাষা মনে হয়েছিল। অন্য মত, বঙ্গদেশের কেরানিকূলকে আসামের প্রশাসনিক কাজে ব্যবহার করার জন্যেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকরা। সেই থেকেই অসমীয়া বাঙালিকে পরস্পর যুযুধান দু'টি জনগোষ্ঠীতে বিভক্ত করে রাজনীতি করেছে পরাধীন ও স্বাধীন দুই রাষ্ট্রেরই কর্ণধাররা। অথচ আমাদের বাঙালিত্বে আছে ব্রহ্মপুত্রের জল মাটি হাওয়ার সুরভি। অসমীয়া জাতিসত্তার গড়ে ওঠায়ও এখানকার বাঙালির অবদান প্রশ্নাতীত। স্বাধীনতার বহু আগে থেকেই আসাম রাজ্যের রাজনীতিতে ভাষা এবং সংস্কৃতির প্রশ্নটিই প্রধান চালিকাশক্তি। প্রকৃতপক্ষে, বিগত একশ বছরেরও বেশি সময় ধরে আসামের রাজনীতি মূলত এক ধরনের সাংস্কৃতিক রাজনীতি। অসমীয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণির রাজনীতির মূল অ্যাজেন্ডাগুলি নির্ধারিত হয়ে এসেছে 'অসম সাহিত্য সভা' নামের সাহিত্য সংস্কৃতির সংগঠনের দ্বারা। আসামের বেশিরভাগ রাজনৈতিক দলের নৈতিক অবস্থান প্রভাবিত হয় 'অসম সাহিত্য সভা'র অবস্থানের দ্বারাই। আসামের শাসকশ্রেণি দু'টো সত্য মেনে নিতে কুণ্ঠিত। এক, আসামে বাঙালিরাও স্থানীয় বাসিন্দাই। দুই, বরাক উপত্যকার বঙ্গভাষী চরিত্র। প্রথমত, বাঙালিদের অনেক পরে আসামে প্রব্রজন হওয়া মারোয়ারি সমাজের এক বড় অংশ বৃহত্তর অসমীয়া সমাজের অংশ হয়ে গেলেও, ভাষা-রাজনীতির যূপকাষ্ঠে পড়ে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার যে সমস্ত বাঙালি মুসলিম মাতৃভাষা ত্যাগ করে দলে দলে সরকারিভাবে আদমশুমারিতে নিজেদের অসমীয়া বলে ঘোষণা করে আসামের জনসংখ্যার ভারসাম্যে অসমীয়াভাষীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ

দিয়েছে, তাঁদেরকেও আজো অসমীয়া সমাজের অন্দরমহলে গ্রহণ করা হয় নি। যখন সুবাতাস বয়, তখন তাঁদের নাম ন-অসমীয়া বা নতুন অসমীয়া। আবার তাঁদেরকে যখন বলির পাঁঠা করার প্রয়োজন হয়, তখন তাঁদের নাম হয় বাংলাদেশি। এটা বাঙালি হিন্দুদের ক্ষেত্রেও অন্যভাবে সত্যি। যতক্ষণ না তাঁরা মাতৃভাষা ত্যাগ করে নিজেদের অসমীয়া বলে পরিচয় দিচ্ছেন ততক্ষণ তাঁরা স্থানীয় লোক নন। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় এমন অনেক অসমীয়া মানুষ পাওয়া যাবে, যাঁদের বাবা, কাকা, এমন কি খুড়তুতো জ্যাঠতুতো ভাইরাও এখনও বাঙালি। একই পরিবারের দুজনের জাতিগত পরিচয় ভিন্ন। জানি না, ভারতবর্ষের আর কোথাও একই পরিবারে একই সাথে মারাঠি এবং গুজরাতি বা কন্নড় এবং তেলেগু লোক পাওয়া যাবে কি না। আসামের সাংস্কৃতিক রাজনীতির ভোজবাজি এমনই। বরাক উপত্যকার ভাষিক চরিত্র নিয়ে ভেদবাদী রাজনীতি করে আসছে আসামের শাসকশ্রেণি স্বাধীনতার অব্যবহিত পর থেকেই। স্বাধীনতার পরেই ব্যাপক সরকারি উদ্যোগের মাধ্যমে গোয়ালপাড়া জেলার ভাষিক চরিত্র যেভাবে আমূল পাল্টে নেওয়া হয়েছে সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে হাতিয়ার করে, তেমনি প্রচেষ্টা হয়েছে বরাক উপত্যকায়ও। এখানকার স্থানীয় বাঙালিদের সাথে দেশভাগের ফলে বাস্তুত্যাগ করে আসা বাঙালির মধ্যে বিভাজন রচনা করার চেষ্টা হয়েছে। ব্রিটিশ শাসনের বহু আগে থেকে ডিমাসা রাজাদের আমল থেকে রাজসভার ভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও, ওই সময়ে বাংলা ভাষায় রচিত অসংখ্য সাহিত্যকর্মের দৃষ্টান্ত থাকা সত্ত্বেও প্রমাণ করার অপচেষ্টা চলছে যে বরাক উপত্যকার কথ্যভাষা বাংলার উপভাষা নয়। এই ষড়যন্ত্রে এখন যোগ দিয়েছেন, জেনে বা না-জেনে, কলকাতার তারকা সাহিত্যরথীরাও। এবারের কলকাতার বিগ হাউস প্রকাশিত শারদ সংখ্যায় একটি উপন্যাসে এক বিগ ঔপন্যাসিক বলেছেন বরাকের মানুষের ভাষা বাংলা নয়। খোদ রাজ্যের নাম নিয়েও রয়েছে সাংস্কৃতিক রাজনীতি। সমস্যা, আসামকে বাংলা বা ইংরাজিতে কী বলা হবে? অসম, অহম না আসাম।

অসম, আসাম - নামে কিবা আসে যায়?

ইংরাজিতে নতুন বানানে Assam এর বদলে কেউ লিখছেন Asom, আবার কেউ Axom। এমনিতে ভাবতে গেলে এ নিয়ে জটিলতার কোন অবকাশ নেই। ক্যালকাটা যদি কলকাতা হয় বা বোম্বে, মুম্বই - তবে আসাম অসম হতে আপত্তি কোথায়? আসামের ভাষা রাজনীতির গভীরে গিয়ে বিষয়টি না দেখলে এমন মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। বস্তুত, আজকাল কেউ জেনে বুঝে, কেউ বা অজ্ঞানতাবশত তড়িঘড়ি বাংলায় 'অসম' লিখছেন। সমস্যা দু'টি। প্রথমত, সংবিধানগত ভাবে এখনও আসামের নাম আসামই। বোম্বে বা মাদ্রাজের মত সংবিধান সংশোধন করে মুম্বই বা চেন্নাই হয় নি। অন্যদিকে, অসমীয়াতে আসামকে অসম লেখা হলেও উচ্চারণে তা অহম, অসম নয়। বাংলায় অসমীয়া অনুসারী বানান লিখতে হলে অহম লেখা বাঞ্ছনীয়, অসম কখনোই নয়। বাংলায় 'অসম' যে ভাবে উচ্চারিত হয়, সে নামে কোনও রাজ্য ভূ-ভারতে নেই। প্রশ্ন উঠতে পারে, যখন গুয়াহাটি থেকে প্রকাশিত ইংরাজি সংবাদপত্র বা সরকারি কাগজপত্রে 'আসাম' শব্দ ব্যবহার এখনও অপরিবর্তিত রয়ে গেছে, এমন কি তরুণ গগৈ-র নেতৃত্বাধীন সরকার যারা মন্ত্রিসভার আচমকা এক সিদ্ধান্তে রাজ্যের নাম পরিবর্তন করে সরকারিভাবে 'অসম' করার প্রস্তাব করে আসামের জনসাধারণ, মূলত অসমীয়া মানুষের বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় পিছু হটে এখনও সরকারিভাবে রাজ্যের নাম 'আসাম'-ই বহাল রেখেছেন, তখন কলকাতার আনন্দবাজার তড়িঘড়ি 'আসাম' বিদায় দিয়ে 'অসম' লিখতে শুরু করেছিল কেন? এ প্রশ্নেরও উত্তর সম্পৃক্ত হয়ে আছে আসামের ভাষা রাজনীতির গভীরে। তবে প্রথমে আসা যাক, রাজ্যের প্রাচীনতম নামের প্রশ্নে। কোনটি আদি নাম? আসাম না অসম? আসামের নামকরণ হয়েছে প্রকৃতপক্ষে শ্যাম জাতির অধ্যুষিত দেশ, আ-শ্যম থেকে। শ্যাম বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া থেকে আগত আহোম নামের মঙ্গোলীয় বংশভূত মানুষদের কথা। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকরাও আ-শ্যম থেকেই রাজ্যের নামকরণ করেছিল, আসাম। আ-শ্যম কথা থেকেই আসলে আহোম শব্দটি এসেছে। আহোম থেকেই এসেছে অহম। 'অসম' শব্দটি প্রকৃতপক্ষে 'অহম' নামের সংস্কৃতকরণের বা আর্যীকরণের ফল। এই সংস্কৃতকরণ বা আর্যীকরণের ব্যাপারটিও একটি বিচিত্র ব্যাপার। এই মুহূর্তে সমগ্র উত্তর পূর্ব ভারতের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সমস্ত ক্ষেত্রে 'ভারতীয় চিহ্ন' বর্জন করার প্রবণতা দেখা দিয়েছে। এখন মনিপুরের জাতীয়তাবাদীরাও বৈষ্ণবীয় পরম্পরাকে ভারতীয়

আগ্রাসনের পূর্বসূরী আখ্যা দিয়ে প্রাক-বৈষ্ণব ধর্মে ফিরে যাওয়ার উন্মাদনায় রাজ্যের নাম বদল করে 'কাইলেংপাক' করতে চান। সেই ধারাতেই নিজেদের সিংহ পদবীর ব্যবহার বাদ দিয়ে নামের শুরুতে গোত্র নাম ব্যবহার করার চর্চা ব্যাপকভাবে শুরু হয়েছে ইদানিং। বাংলা লিপি ও বৈষ্ণব ইতিহাসের সমস্ত স্মারক মুছে দেওয়ার জন্য শতাব্দী প্রাচীন গ্রন্থাগারের কয়েক লক্ষ বইয়ের বহ্ন্যুৎসব হয়েছে। উনবিংশ শতকে বিষয়টি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নমুখী। আসামের কথাই ধরা যাক। আজ যে আসামের জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ কথায় কথায় ভারতীয়ত্ব বর্জনের কথা বলেন, সেই সংগঠন, সেই জাতীয়তাবাদীরা উনবিংশ শতকে অসমীয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণির উন্মেষপর্বে নিজেদেরকে আর্য সভ্যতার উত্তরসূরী প্রমাণ করার জন্যে তৎপর ছিলেন। উত্তর ভারতীয় সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সাথে নিজেদেরকে যুক্ত করতে চেয়ে তাঁরা এমনও অভিমত সেদিন প্রকাশ করেছিলেন যে অসমীয়া ভাষায় আধুনিক সঙ্গীত বা সাহিত্য রচিত হতে পারে না। এই ভাষা কেবল লোকসঙ্গীত বা লোকসাহিত্যেরই পৃষ্ঠপোষকতা করতে পারে। আধুনিক অসমীয়া সঙ্গীতকে হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় সুর শুধু নয়, বাণীর জন্যেও আশ্রয় নিতে হবে বাংলা বা হিন্দি ভাষার কাছে। এই প্রবণতার বিরুদ্ধেই লড়াই করে পরবর্তীতে অসমীয়া আধুনিক সঙ্গীতের রূপকার, আসাম গণনাট্যের প্রথম সভাপতি জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়াল অসমীয়া লোক সুরের পরম্পরা ও অসমীয়া ভাষার বিচিত্র সৌন্দর্যকে নির্ভর করে তৈরি করেন অসমীয়া আধুনিক গানের প্রাথমিক ভিত্তি। আবার ফিরে আসি, রাজ্যের নামকরণের প্রশ্নে। অসমীয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণির উন্মেষ পর্বে সংস্কৃতকরণের পর্যায়ে, আসামকে পাহাড় সমতলের সমন্বয়ে গড়া অ-সম মাটির দেশ থেকে রাজ্যের নাম হয়েছে 'অসম', এমনটাই বলার চেষ্টা হয়েছে। এই কথা বলে 'অহম' শব্দের বানান পাল্টে করা হয় 'অসম'। যদিও উচ্চারণ একই থাকে। এই দাবি সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক। আসামের কোন স্থানীয় ভাষাতেই সংস্কৃত ভাঙা শব্দ পাওয়া যাবে না। সময়ের দীর্ঘ পরিবর্তনের পর আর্য সভ্যতার সাথে নিজেদের একাত্ম করে তোলার বিপরীত পথেই অবশ্য যাত্রা করছে অসমীয়া উগ্র জাতীয়তাবাদী রাজনীতি বা সাংস্কৃতিক রাজনীতি। এখন সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে, সাংস্কৃতিক-রাজনীতির ভিন্নতর কৌশল হিসাবে 'অসম' নাম নিয়ে চলছে কূট রাজনীতি। এক উগ্র জাতীয়তাবাদী সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক প্রকল্প নির্মাণের অঙ্গ হিসাবেই ব্যবহার করা হচ্ছে রাজ্যের নাম বিষয়ক রাজনীতির বিষয়টি। বাস্তবে আসাম রাজ্যটি বহুভাষিক বহুজাতিগোষ্ঠী অধ্যুষিত রাজ্য। প্রধান জনগোষ্ঠী অসমীয়া ভাষীরা মোট জনসংখ্যার মাত্র অর্ধেকের একটু বেশি। যেভাবে জাতীয় স্তরে এক শ্রেণির ইতিহাসবিদরা হিন্দি- হিন্দু- হিন্দুস্থান এই সরলীকরণের মধ্য দিয়ে ভারত রাষ্ট্রের এক ভাষাগত ও ধর্মগত সাম্প্রদায়িক নির্মানের চেষ্টা করেন, তারই মত করে আসামকে 'অসম' বললে অসমীয়া ভাষা ও সংস্কৃতির সাথে তাকে একীকৃত করে দেখা যায়, যার মধ্য দিয়ে লঘু করে দেওয়া যায় বা ভুলিয়ে দেওয়ার এই চেষ্টা হয় যে আসাম মূলত একটি বহুভাষিক বহুজাতিগোষ্ঠী অধ্যুষিত একটি রাজ্য। এখনও কোনও অসমীয়া মানুষ বাংলায়, হিন্দিতে বা ইংরেজিতে কথা বলার সময় আসামকে 'অসম' বলেন না। যদিও আনন্দবাজারের দেখাদেখি আসামের বেশিরভাগ বাংলা কাগজে 'আসাম'কে 'অসম' লেখা শুরু হয়ে গেছে। কিছুদিন আগেকার এক অভিজ্ঞতা, স্টার আনন্দে একটি অনুষ্ঠানে সংবাদ পাঠিকা যখন আসামকে বাংলায় অসম বলছেন তখন ওই অনুষ্ঠানেই বাংলায় সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে অগপ দলের অসমীয়া নেতা অপূর্ব ভট্টাচার্য আসামকে আসামই বলে গেলেন আগাগোড়া।

আমার যে গান

লোকসঙ্গীত আর শাস্ত্রীয় সঙ্গীত নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে হেমাঙ্গ বিশ্বাস বলেছিলেন, শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের যেমন ঘরানা, লোকসঙ্গীতের তেমনি হচ্ছে বাহিরানা। শব্দটি হেমাঙ্গ বিশ্বাসের নিজের সৃষ্টি। লোকসঙ্গীতের আঞ্চলিকতা বোঝাতে 'বাহিরানা' শব্দটি তৈরি করেছিলেন তিনি। আমাদের বরাক উপত্যকার আধুনিক বাঙালির সঙ্গীত নাটক সাহিত্যে এক ধরনের আঞ্চলিক স্বর রয়েছে যা লোকগানের বাহিরানার মতোই। এই আঞ্চলিকতা মফস্বলিয়ানা নয়, যা জন্ম নেয় কেন্দ্র থেকে দূরত্বজনিত অভিমানে। দূরত্বের অভিমান এ অঞ্চলেও রয়েছে। কিন্তু এখানকার 'বাহিরানা' ভাষা পেয়েছে এ অঞ্চলের ইতিহাস ও ভূগোলের ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে। আমাদের বাহিরানার কথা, আমাদের 'অন্য বাঙালিত্ব' এর কথা কবি অমিতাভ দেব চৌধুরী একটি নিবন্ধে বলেছেন এ ভাবে :

আমাদের ডিমাসা রাজা যেসব উজ্জ্বল মাতৃস্তোত্র রচনা করেছিলেন, তার একটিতে ছিল এরকম একটি পংক্তি :' চৌদিকে অরণ্যের মধ্যে মাও তোমার নামটি জাগে।' পংক্তিটির অন্তর্গত অরণ্য হালিশহরের সেই নির্জন ও মাতৃভক্ত কবিটির স্বপ্নেও সম্ভবত হানা দিত না। কারণ তাঁর বাস্তবতা ও ভূগোল অরণ্যশঙ্কুল ছিল না। কিন্তু আমরা অরণ্যভূধরবেষ্টিত। এই অরণ্যাচ্ছাদিত ভূগোলে আমরা যখন ধ্যানে আর কল্পনায়, শ্রমে আর নির্মানে গড়ে তুলি আমাদের কাব্যলক্ষ্মীর অবয়ব, তখন সেই কাব্যলক্ষ্মীর মূর্তির কোথাও, অন্তত তার অধরের গোপন হাসিটিতে, জেগে থাকে এক উপজাতীয় কিংবা অসমীয়া কিংবা মনিপুরি হাসি। ঠিক এখানটাতেই আমরা বাঙালি হয়েও মূল স্রোতের বাঙালির থেকে আলাদা।

উনবিংশ শতকে যখন একটি পুরোদস্তুর আধুনিক শহর হিসাবে শিলচর আত্মপ্রকাশ করে নি, তখনও কলকাতার সাহিত্য সংস্কৃতির খবর পৌঁছে যেত প্রত্যন্ত এই অঞ্চলেও। নাগরিক চেতনার প্রাথমিক উন্মেষের দিনগুলিতেই এই উপত্যকার কবি রামকুমার নন্দী মজুমদার শিলচর শহরে বসে মাইকেলের 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের উত্তরে 'বীরাঙ্গনা পত্রোত্তর কাব্য' রচনা করেন অমিত্রাক্ষর ছন্দে। উনবিংশ শতকের বাংলা উপন্যাসের আদলে উপন্যাস রচনারও দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় সেই সময়ের সাহিত্যকর্মে। ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের হাত ধরে যে নাগরিক সাহিত্য সঙ্গীত নাটকের ধারাটি এখানে আত্মপ্রকাশ করে গোড়ার যুগ থেকে দীর্ঘকাল পর্বে তা ছিল কলকাতামুখী। আমাদের আবহমান বাঙালিত্বের যে 'অন্য' চেহারা এখানে আলোচিত হচ্ছে, তা আমাদের নাগরিক কাব্যে নাটকে সঙ্গীতে অবয়ব পেয়েছে এক দীর্ঘ সময়ের পর। বরাক উপত্যকার সাম্প্রতিক সময়ের বাঙালিত্বকে যে ভাষাসংগ্রামের উত্তরাধিকার হিসাবে দেখা হয়, ১৯৬১ সালের সেই রক্তঝরা দিনগুলিতে বা তার অব্যবহিত পরে এ অঞ্চলের নাগরিক সাহিত্য সংস্কৃতিতে তার প্রতিফলন প্রায় ছিল না বললেই চলে। শুধু ১৯৬১ নয়, ভাষা সংগ্রামের দ্বিতীয় পর্যায় ১৯৭২ সাল বা তার পরবর্তী সময়েও এ অঞ্চলের সাহিত্য সঙ্গীত নাটক এ বিষয়ে ছিল সম্পূর্ণই নিরুৎসাহী। এ অঞ্চলের প্রতিনিধিস্থানীয় কবি সাহিত্যিকদের মনোজগৎ তখনও এক অর্থে কলকাতার সাংস্কৃতিক উপনিবেশ। গল্প-কবিতার ভাষা ও চিত্রকল্পে তখনও রাজধানীর ছায়া। নাট্যমঞ্চে ২৪ পরগণা জেলার দক্ষিণাঞ্চলের উপভাষায় কৃষকের কান্না অথবা উত্তরাঞ্চলের শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকদের জীবনের সংগ্রামের প্রতিধ্বনি। সাতের দশকের শেষ থেকে আবার উত্তাল হয়ে উঠল আসামের রাজনীতি। ষাটের বা বাহাত্তরের ভাষা দাঙ্গার চেয়েও আরো ব্যাপক আক্রমণ নেমে এলো সারা রাজ্য জুড়ে ভাষিক সংখ্যালঘুদের ওপর। অসমীয়া উগ্রজাতীয়তাবাদী শক্তির সমস্ত ক্রোধ কেন্দ্রীভূত হল হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে বঙ্গভাষীদের ওপর। শয়ে শয়ে মানুষ প্রাণ হারালেন। এবারের আর 'বঙাল খেদা' নয়, দাঙ্গানির্ভর এই আন্দোলনের নতুন নাম হল 'বিদেশি বিতাড়ন আন্দোলন'। আন্দোলনও সীমাবদ্ধ থাকল না শুধু আসাম রাজ্যের অভ্যন্তরে। ছড়িয়ে পড়ল ত্রিপুরা ছাড়া (যদিও বিজয় রাংখলকে দিয়ে সেখানেও বাঙালি বিরোধী দাঙ্গার একটা চক্রান্ত হয়েছিল) উত্তর পূর্বের সমস্ত রাজ্যে। 'বিদেশি' বলে আখ্যায়িত করে বাঙালিদের এ দেশে বসবাস করার অধিকার নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হল। যে জন্মাবধি উত্তর পূর্বের আলো হাওয়া রৌদ্রে মানুষ, বাংলার পূব এবং পশ্চিম যাঁদের কাছে সুদূরের বিদেশ প্রায়, তাঁদেরকেও বলা হল বাংলাদেশী। ইতিহাসের নিষ্ঠুর খেলার পুনরাবৃত্তির অভিঘাত এসে পড়ল এ অঞ্চলের শিল্পসাহিত্যে। যে বরাক উপত্যকার নাটকে ছিল কলকাতার মঞ্চের অনুকৃতি, 'সেখানে শোনা গেল লৌকিক সুর ও মর্মর। যে বরাক উপত্যকার গল্পে একদা আধুনিকতাবাদী ক্ষয়কাতরতা বাসা বাঁধবার প্রস্তুতি নিচ্ছিল, সেখানে দেখা গেল পরপর উঠে আসছে বাস্তুচ্যুতি, আশা ও শিকড়খোঁজার নানা অভিজ্ঞান।' বাংলার লোক সাহিত্য, আমাদের চিরকালীন লোকায়ত গান, এমন কি রবীন্দ্রসঙ্গীতেরও যেন এক নতুন পাঠ গড়ে উঠল এই নির্বাসিত মাটিতে। চাঁদ সওদাগরের বিরুদ্ধে নাগকন্যা মনসার লড়াইকে দেখা হল আমাদের ভাষাসংগ্রামের প্রেক্ষাপটে এ অঞ্চলের নাটকে। চাঁদ সওদাগরের বাঁ হাতের পুজো যেন আমাদের আংশিক অধিকার প্রাপ্তির প্রতীক। যখন বরাক উপত্যকার লোকগায়ক গান, 'জনমদুখি কপালপুরা গুরু আমি একজনা/...শিশুকালে মরে গেল মা, গর্ভে রেখে মরল পিতা গুরু চোখে দেখলাম', তখন তাঁর গায়নে মিশে যায় আঞ্চলিক অভিমান। এমনকী নাগরিক শিল্পী যখন গাইতে ওঠেন, 'পরবাসী চলে এসো ঘরে/..আকাশে আকাশে আয়োজন, বাতাসে বাতাসে আমন্ত্রণ/ মন যে দিল না সাড়া, তাই তুমি গৃহছাড়া/ নির্বাসিত বাহিরে অন্তরে', তখন আমাদের নির্বাসিতসত্তা যেন ঘরের ডাক শুনতে পায়! এটাই এ মাটির 'বাহিরানা'। আটের দশকে এসে ছয়ের দশকের কৃত্তিবাসীয় কবিতা আন্দোলনের অগ্রণী কবি লেখেন -

যে কেড়েছে বাস্তুভিটা, সে-ই কেড়েছে ভয়

আকাশ জুড়ে লেখা আমার আত্মপরিচয়।
হিংসাজয়ী যুদ্ধে যাব, আর হবে না ভুল
মেখলা-পরা বোন দিয়েছে একখানা তাম্বুল
এবার আমি পাঠ নিয়েছি- আর কিছুতেই নয়,
ভাষাবিহীন ভালোবাসার বিশ্ববিদ্যালয়।
বাংলা আমার আই-ভাষা গো, বিশ্ব আমার ঠাঁই
প্রফুল্ল আর ভৃগু আমার খুল্লতাত ভাই!
(শক্তিপদ ব্রহ্মচারী)

ভাষাশহীদের মাটি থেকে এখানকার কবি যখন বৃহত্তর বঙ্গে যান, ফিরে এসে তাঁর কবিতায় লেখা হয় এমন পংক্তি-

আমি কোত্থেকে এসেছি, তার জবাবে যখন বললাম
করিমগঞ্জ, আসাম
তিনি খুশিতে ডগমগ হয়ে বললেন ঃ বাঃ, বেশ সুন্দর
বাংলা বলছেন তো!
একজন শিক্ষিত তথা সাহিত্যিকের যখন এই ধারণা, তখন
আমি আর কি বলতে পারি!
ওঁকে ঠিক জায়গাটা ধরিয়ে দিতে গিয়ে বললাম ঃ
বাংলাভাষার পঞ্চদশ শহিদের ভূমিতে আমার বাস।
তিনি তখন আক্ষরিক অর্থেই আমাকে ভিরমি
খাইয়ে দিয়ে বললেন ঃ
ওঃ, বাংলাদেশ? তাই বলুন।
(দিলীপকান্তি লস্কর)

এখানকার মাটি ও মানুষের পরিচিতি নিয়ে ঘরে বাইরে বিভ্রান্তি, নাকি উদাসীনতা! এ সময়ের এ অঞ্চলের অসংখ্য গানে ভাষা পেয়েছে এক অভিমানীস্বর-

এপার বাংলা, ওপার বাংলা, মধ্যে জলধি নদী
নির্বাসিতা নদীর বুকে বাংলায় গান বাঁধি
বাংলাই কাঁদে বেহুলা ভেলায়, দেশবিভাগের শ্মশানে
একুশে-উনিশে রফিক-কমলা জ্বলে রাজপথে ময়দানে
বাংলা আমার তেষ্টা মেটায়, জল নয়তো পানি
বাংলায় আমি রবিঠাকুর আর জীবনানন্দ জানি
আমিও শিখেছি অ-এ অজগর ব-মানে শুধু বন্যা
প্রথম প্রেমের শব্দ বলেছি শ্যামলবরণী কন্যা
আমার বাউল মুর্শিদি গানে, এপার ওপার বাঁধা
বাংলা কখনো ফতেমাবিবি, বাংলা কখনো রাধা
ছিন্নবাস্তু নির্বাসিত, এপার ওপার গেছে
মা'র দুধটুকু তবুও আমায় বাংলাই শিখিয়েছে।
(কালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্য)

বরাক উপত্যকা সাথে দেশের বাকি অংশের ভৌগোলিক যোগাযোগ ক্ষীণ সুতো দিয়ে বাঁধা, প্রকৃতির খেয়ালখুশিতে মুহূর্তে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এই প্রান্তিক মাটি। এটা বছরের বারো মাসের বেশিরভাগ সময়েরই বাস্তবতা। এই প্রাকৃতিক ঘটনাটি সামাজিক সাংস্কৃতিক বাস্তবতারও প্রতীক।

নীচে নদী লোভা, খরস্রোতা, পাড়ে ধস,
পাহাড়ে, ধসের দুদিকে গাড়ি, কিছু প্রাণ
তবু হাতে প্রাণ নিয়ে জুতো ব্যাগ নিয়ে ওদের পেরোতে হয়
জীবনের সব কাজ ভীষণ জরুরি আজকাল।
এদিকে একটি গাড়ি ছেড়ে ওদিকে অন্য একটি গাড়ি ভাড়া নেয়
বরাকভূমির লোক এভাবেই চলে ছয় মাস, কখনো
আটকে পড়ে, রেল সড়ক কিংবা আকাশপথ
সব বন্ধ হয়ে যায়- তবু সমস্ত দেশের সঙ্গে
কীভাবে যে ঝুলে আছি তাই ভাবি
(বিজিৎ কুমার ভট্টাচার্য)

লোকসাহিত্য থেকে আধুনিক নাগরিক সাহিত্যে প্রবেশ করার পর সাধারণভাবে শুনতে পাওয়া যায় ব্যক্তির কণ্ঠস্বর। আঞ্চলিক কথনভঙ্গী থাকলেও সেখানে থাকে না লোকসাহিত্যের আঞ্চলিকতার স্বর। বরাক উপত্যকায় সম্প্রতি সময়ের কাব্যে সাহিত্যে নাটকে সঙ্গীতে বারবারই শোনা যাবে সমূহের স্বর। 'আমি' যেন রূপান্তরিত হয় 'আমরা'য় ।

যে ট্রেন যায়নি কোনো দিন, আমি তার যাত্রী ছিলাম

বিদায় চুম্বনগুলি, দেশের ভিটের বাস্তুসাপটির মতো
কিংবদন্তীজন্ম ফিরে পেল।
অবাক অপেক্ষাগুলি রাজপথে খুর ঠুকে ঠুকে নামাল গোধুলি।

তারপর কত ট্রেন গেল, কত কত কামরার ঘুম
বাক্যহারা স্টেশনে ফুরোল।
তবু সেই না-যাওয়ার স্বপ্নভ্রষ্ট ছায়া, পরবর্তী প্রতিটি যাওয়ায়,
দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হল যে কেবল।

আমার সকল সেই না-যাওয়ার ভারে
আজীবন ফেরা হয়ে ওঠে।
আমাদের সব থাকা সেই না-যাওয়ার ভারে
সড়কের পাশে, সস্তা হোটেল খোঁজে
পরিত্রাণ, মূলস্রোত, ললাটলিখন

যাওয়া-না-যাওয়ার মাঝে
একটি অচল সেতু কারাগার হয়ে ওঠে ক্রমে।
যে ট্রেন যাবে না কোনদিন, আমরা তার যাত্রী ছিলাম।
(অমিতাভ দেব চৌধুরী)

প্রকৃতপক্ষে বাংলার মূল ভূখণ্ড থেকে ভৌগোলিক ও মানসিক দূরত্ব, আশাভঙ্গ, বিশ্বাসভঙ্গের আবর্তে পড়ে এখানকার বেঁচে থাকায় এক ধরনের কৌমসমাজের প্রতিচ্ছবি যেন দেখতে পাওয়া যায়। লেখক, শিল্পী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ অবধি যেন পারস্পরিক ভালোবাসায় বাঁচে, হাজারো স্বপ্নভঙ্গের মধ্যেও বাঁচার স্বপ্ন দেখে। বরাক উপত্যকায়, বিশেষ করে শিলচর শহরে বিগত দশকে আত্মপ্রকাশ করেছে এমন কিছু মঞ্চ, যা সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের নানা আঞ্চলিক উপলব্ধিকে ভাষা দিচ্ছে। 'সম্মিলিত সাংস্কৃতিক মঞ্চ' নামে

একটি সংগঠন রয়েছে, দলীয় রাজনীতিতে দ্বিধাদীর্ণ সময়েও যার কোনও দলীয় চরিত্র নেই। ভাষা সংস্কৃতি রাজনীতির নানা প্রশ্নে এই উপত্যকার কণ্ঠকে ভাষা দিচ্ছে এই মঞ্চ। এ ধরনের মঞ্চে দলের চেয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে সমাজ। এই ধরনের সামাজিক অভিব্যক্তি এক কৌম জীবনে যেন ফিরিয়ে এনেছে এখানকার মানুষকে। ফলেই প্রতিটি শিল্পী, সাহিত্যিক, এমনকি সাধারণ মানুষ হয়ে উঠছেন এই 'বাহিরানা'র এক একজন অ্যাক্টিভিস্ট।

এ অঞ্চলের বাঙালিকে তাঁর আত্মপরিচয়ের সনদ নিয়ে আজীবন ঘুরে বেড়াতে হয়। যাঁরা কখনো পনেরো আগস্ট বা ছাব্বিশে জানুয়ারি কালো পতাকা তোলে নি, যাঁরা তাঁদের অস্তিত্ব নিয়ে দশকের পর দশক ধরে মারণখেলা চললেও কখনো ভারত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র তোলে নি, যাঁদের ইচ্ছা অনিচ্ছাকে তোয়াক্কা না করেই বারবার যাঁদের দেশ বদল করা হয়েছে, তাঁদের ভারতীয়ত্ব নিয়েই বারবার সন্দেহ। এই রাষ্ট্রের প্রশ্নাতীত শরিক হচ্ছে তাঁরা, যাঁরা এই রাষ্ট্রকে স্বীকার করে না, যাঁরা নিজেদের ভারতীয় বলতে ঘৃণা করে। একটি সরকারি কাগজের এদিক ওদিকে জন্মসূত্রে একজন ভারতীয়কে বাংলাদেশী বলে সীমান্তের ওপারে ঠেলে দেওয়া হতে পারে। শুধু কিছু কাগজপত্র ঠিকঠাক গুছিয়ে রাখা হয় নি বলে, আসামে লক্ষ লক্ষ বাঙালি রয়েছে যাঁদের ভোটাধিকার নেই। একটাই অপরাধ ১৯৬৬ সালের ভোটার তালিকায় তাঁদের বা তাঁদের পরিবারের কারো নাম থাকার প্রমাণ তাঁদের হাতে নেই। তাঁরা আবার 'বিদেশি' হিসেবেও প্রমাণিত হন নি। ভারতে থেকেও ভোটাধিকার নেই। তাঁদের নাম ডি-ভোটার, অর্থাৎ ডাউটফুল ভোটার। এই লেখার প্রথম খসড়াটি পত্রিকা সম্পাদককে পাঠানের পরের দিনই, ২০ নভেম্বর গুয়াহাটি থেকে প্রকাশিত দৈনিক যুগশঙ্খের একটি সংবাদ প্রতিবেদন পড়ে স্তব্ধ হয়ে গেলাম।

'বিদেশি' বাবা মা ১০ মাস ধরে ডিটেনশন ক্যাম্পে/ হতভাগ্য ছেলেমেয়ের আত্মাহুতির হুমকি

স্টাফ রিপোর্টার, গুয়াহাটি, ১৯ নভেম্বর : এ যেন আরেক 'দুর্গা'র কাহিনি। এবার 'বিদেশি' বাবা মা'র মুক্তির দাবিতে হন্যে হয়ে ঘুরছে ছেলে। পিঠে 'বিদেশি'র তকমা লাগানো বাবা মা'র ঠাঁই হয়েছে ডিটেনশন ক্যাম্পে। হাতে রয়েছে ১৯৬৪ সালের নথিপত্রও। কিন্তু ভারত সরকারের সেই নথিও ভাগ্য বদলাতে পারে নি সত্যবান ও মালতী দাসের। তাই বাবা মা'র মুক্তি চেয়ে আইনি লড়াই লড়ছেন ছেলে বিজয় দাস। কিন্তু ১০ মাসে মেলেনি বিচার। তাই হতভাগ্য বিজয় আজ পাঁচ ভাইবোনকে নিয়ে আত্মাহুতির হুমকি দিয়েছেন।

গোয়ালপাড়ার জেলার কটাকুটি থানার বাপুজি নগরে দীর্ঘদির ধরেই বসবাস সত্যবান ও মালতী দাসের পরিবারের। কিন্তু ১৪ জানুয়ারি যেন হঠাৎ করেই বজ্রপাত হয় সুখী পরিবারে। ভোর ছ'টা নাগাদ পুলিশের দল এসে হাজির সত্যবানের বাড়িতে। অভিযোগ, তিনি নিজে এবং তাঁর স্ত্রী 'বিদেশি'। তাই উপযুক্ত নথিপত্র-প্রমাণাদি নিয়ে থানায় ডেকে পাঠানো হয় তাঁদের। পুলিশই তাঁদের থানায় ধরে নিয়ে যায়। পুলিশের নির্মম আচরণ থেকে মা বাবাকে মুক্ত করতে পরিবারের অন্যান্য বৈধ নাগরিকদের নথিপত্র নিয়ে গিয়ে থানায় দেখান। কিন্তু পুলিশ তাতে পাত্তাও দেয় নি। উল্টে নথিপত্র ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কোনও বিচার ছাড়াই সত্যবান-মালতীকে পাঠিয়ে দেয় ডিটেনশন ক্যাম্পে। তখন থেকেই তাঁরা ডিটেনশন ক্যাম্পে অমানবিক নির্যাতনের শিকার। আজ পর্যন্ত তা সইতে হচ্ছে এবং কবে এই নরকভোগ শেষ হবে, তা অদৃষ্টই বলতে পারবে। ডিটনশন ক্যাম্পে নিজের মা বাবার সাথে চোর-ডাকাতের মত ব্যবহার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ বিজয়ের। এমন কি দেখা করতে চাইলেই মা-বাবার সঙ্গে তাঁদের দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না।

পূর্ব পাকিস্তান থেকে ১৯৬৪ সালেই ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন সত্যবান দাসের বাবা দেবেন্দ্র চন্দ্র দাস। ভারত সরকারের পুনর্বাসন মন্ত্রক ১৯৬৪ সালেই তাঁকে সপরিবারে ভারতে বসবাসের যোগ্যতা দেয়। সরকারি অনুদান পাওয়ার যোগ্যতামূলক সার্টিফিকেটও রয়েছে দেবেন্দ্রের পরিবারের হাতে। কিন্তু ১৯৬৪ সালে ভারতে আশ্রয় নেওয়া দেবেন্দ্রের পুত্র সত্যবান দাসই এখন 'বিদেশি'। সত্যবান-মালতীর গায়ে বিদেশির তকমা পড়ে গেলেও তাঁদের ছয় ছেলেমেয়ে কিন্তু ভারতীয়। তাই বিদেশির নামে বৃদ্ধ বাবা মায়ের নির্যাতন দেখতে হচ্ছে তাঁদের।

১৯৭১ সালের বহু আগে ভারতে আশ্রয় নেওয়ার বৈধ নথিপত্র থাকা সত্ত্বেও অবশ্য রেহাই দেওয়া হয় নি সত্যবান-মালতীকে। ২০০৬ সাল থেকেই গোয়ালপাড়া বিদেশি ট্রাইবুন্যালে বিদেশি মামলা চলছে তাঁদের নামে। সেখানে বৈধ নাগরিক প্রমাণের তাগিদে লড়তে হচ্ছে তাঁদের। ট্রাইবুন্যালের বিচার প্রক্রিয়ায় সাড়া না পেয়ে ২০০৮ সালে গৌহাটি হাইকোর্টের দ্বরস্থ হন তাঁরা। আদালত পুরো বিষয়টিতে স্থগিতাদেশ জারি করলেও পুলিশি নির্যাতন আজো বন্ধ হয় নি। আদালতের তোয়াক্কা না করেই ডিটনশন ক্যাম্পে

ঠেলে দেওয়া হয়েছে সত্যবান-মালতীকে। তাই বিচারের আশায় দ্বারে-দ্বারে ঘুরে ক্লান্ত বিজয়ের প্রশ্ন হচ্ছে, 'বাবা-মা যদি বিদেশি হন, তাহলে আমরা কী? আমরা কি এদেশের নাগরিক? যদি না-হই তাহলে আমাদের গুলি করে মারা হোক। না হলে ভাইবোনকে নিয়ে আত্মাহুতি দেব।'

অপরাধ প্রমাণের আইনগত ব্যবস্থা সারা পৃথিবীতে একরকম, আর আসামে তথাকথিত বিদেশি নাগরিক চিহ্নিতকরণ ও বহিষ্কারের বেলা সম্পূর্ণ উল্টো। ১৯৮৫ সালে তৎকালীন রাজীব গান্ধী ও আসামের অসমীয়া উগ্রজাতীয়তার প্রতিনিধি ছাত্র সংগঠন আসুর মধ্যে হওয়া 'আসাম চুক্তি' অনুযায়ী, কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে সেই থানা এলাকার কোনও নাগরিক যদি এই অভিযোগ করেন যে অভিযুক্ত ব্যক্তি বিদেশি, তবে অভিযুক্ত ব্যক্তিকেই প্রমাণ করতে হবে, তিনি ভারতীয়। অভিযোগকারীর বা পুলিশ বিভাগ বা আইন বিভাগের দায় নেই, তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করার। সাধারণ আইন ব্যবস্থায় অভিযোগকারীর ওপরই দায়িত্ব বর্তায় তাঁর অভিযোগের স্বপক্ষে প্রমাণ যোগাড়ের। এক্ষেত্রে উল্টো, যেন অভিযুক্ত চোর বা ডাকাতকেই প্রমাণ করতে হবে, তিনি সাধু। নচেৎ কোনও প্রমাণ থাক, আর নাই থাক, তিনি চোর। আসামে 'বিদেশি' চিহ্নিতকরণ হয় এই নিয়মেই। যে কেউ অভিযোগ করলেই একজন মানুষ 'বিদেশি' হয়ে যান। তারপর তাঁকেই প্রমাণ করতে হবে, তিনি 'বিদেশি' নন, ভারতীয়। উত্তরপূর্ব ভারতের বিশিষ্ট সমাজ বিজ্ঞানী ড° বাণীপ্রসন্ন মিশ্র সম্প্রতি একটি বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলেছিলেন, আসামের একটি বাঙালি শিশু তার অন্নপ্রাশনের দিন তার সামনে বাড়িয়ে দেওয়া থালায় রাখা মাটির তাল, কলম, বই, টাকা, সোনা থেকে যদি মাটিটাকে বেছে আঁকড়েও ধরে তবু এই অঞ্চলের মাটিতে তার শেকড় নির্মাণ হয় না। সে তবু এখানে 'থলুয়া' বা 'নেটিভ' বা 'ভূমিপুত্র'র স্বীকৃতি পাবে না। তাঁকে আমৃত্যু বয়ে বেড়াতে হবে পি.আর.সি (পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট)।

আবার ফিরে যাই নিজের কথায়। ১৯৯৯ সালে করিমগঞ্জের কুশিয়ারা নদীর আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরিয়ে প্রথমবার বাংলাদেশ যাওয়ার দিনটি নিয়ে লেখা আমার ব্যক্তিগত ডায়েরির অংশ দিয়েই এ লেখা শেষ করছি।

এ শহরে এলেই নদীর এপার থেকে ওপারে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকা আমার অনেক দিনের স্বভাব। একটা বিস্ময় আর কৌতুহল মিশে থাকে এই চাওয়ায়। প্রথমবার এ শহরে এসেছিলাম অবশ্য ওপারে যাবার জন্যেই। সেবার গিয়েছিলাম অন্য পথে। সুতারকান্দি হয়ে। ফলেই এ নদীটা এখনো বিস্ময় আর কৌতুহল জাগায়। তখন হাফপ্যান্ট বয়স, বাবার সরকারি সফর ছিল সিলেটে। সকালে গিয়ে রাতে ফিরেছিলাম। সেবার মা'ই ছিল সবচেয়ে রোমাঞ্চিত। এম সি কলেজে যাবার পর ছুটে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে মা'র চটি ছিঁড়ে ফেলা দেখে বাবা বলেছিল,'তোমার মাকে বল, কলেজ ছাড়ার ছাব্বিশ বছর হয়ে গেছে। এভাবে এখন ছুটলে হাসপাতালে যেতে হবে।' পরে বান্ধবী হোসেনারা বেগমের বাড়ীতে মা ও হোসেনারা বেগম আবেগাপ্লুত হয়ে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে শৈশবে ফিরে যাচ্ছিল প্রায়। আমাদের দিকে চোখ পড়তেই হোসেনারা বেগম বললেন বাবাকে, 'আমরা দু'জন এখন যেখানে ফিরে গিয়েছি, সেখানে আপনিও নেই, আপনার ছেলেমেয়েরাও নেই। আমরা এখন ছাব্বিশ বছর পিছিয়ে।' রাতে ফেরার পথে বর্ডার পেরোতেই দাদা বলল,'মা, বিদেশ সফর শেষ করে স্বদেশে ফিরলাম।' মা অন্যমনস্ক, বলল অস্ফুটে,'স্বদেশ বিদেশ আমার গুলিয়ে গেছে। আমি জানি না কোথায় গিয়েছিলাম, আর কোথায় ফিরলাম।' পরে অনন্তকাকুকেও দেখেছি সবসময়ই শিলচর বললে, 'তুমরার শিলচর', আর সিলেট বললে, 'আমরার সিলেট' বলতে। একটা দীর্ঘশ্বাস ঐ প্রজন্মের সকলেরই বুক গভীরে। এটা শুনে শুনেই আমাদের বড় হওয়া। ওপার আমরা দেখিনি সেভাবে, তবে এই দীর্ঘশ্বাস আর হঠাৎ কোনো আলোচনার প্রসঙ্গে ছলছল করে ওঠা মায়ের চোখে যা দেখেছি, সে তো ওপারই । এতদিন ছিল 'ওপার পানে কেঁদে চাওয়া। এবার, ওপারে পৌঁছানোর প্রতীক্ষা। কাল রাতেও বিশ্বাস করতে পারিনি সত্যিই ভিসা এসে পৌঁছাবে সময়মত। বর্ডারের সব কাজ শেষ, এখন মাঝির অপেক্ষা। ওপারে লোক চলে এসেছেন নিয়ে যেতে, মাঝি খবর দিল। একটু একটু করে দূরে সরে যাচ্ছে করিমগঞ্জের ঘাট, কাছে আসছে এতদিনের 'কেঁদে চাওয়া' ওপার। এতদিন সমস্ত রহস্য আর বিস্ময় নিয়ে যে ছিল দূরে, স্থির। আজ সচল হয়ে সেই এগিয়ে আসছে নৌকোর বৈঠার সঙ্গে সঙ্গে। ছলাৎ ছলাৎ শব্দে পেরোচ্ছি কুশিয়ারা। এপারে, থেকেও আমরা নেই, ওপারের তো নই-ই। ৬৬'র ভোটার তালিকা, আসাম চুক্তি, বিদেশী বিতাড়ন, এই ঘূর্ণিপাকে এই নির্বাসিতা নদীর বুকে বসেই আমরা বারবার জীবনের সব তন্ত্রীতে চেষ্টা করেছি বাংলায় গান বাঁধার। এই বাংলা কখনো ফতেমা বিবি, আবার কখনো রাধা, যদিও মাঝখানে ইঁটের পাঁচিলের মত হাজার হাজার কুশিয়ারা। পাঁচিল তো নয়, আমাদের নিজের হাতে কাটা খাল। কুমিরের স্বদেশ। নৌকো ঠেকল ওপারে, এগিয়ে এলেন বান্নাভাই, মালতী ও আরেকজন যাকে চিনি না তখনো। এধরণের বাঁধানো ঘাট না-থাকা পারে নৌকো থেকে লাফ দিয়ে

নামতে হয়। পা ডাঙা ছুঁতেই কে যেন গেয়ে উঠল প্রাণের গভীরে,'তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা।' সঙ্গে সঙ্গেই বুকটা ঢিপ করে ওঠে। মায়ের স্বদেশ বিদেশ গুলিয়ে যাওয়া সেই নো-ম্যান্‌স্‌ল্যান্ড এবার বাসা খোঁজে আমার বুকে। 'কী আমার পরিচয়, মা?'